দৈনিক খবর ২১

তারিখ ... 23 DEC 1988
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৮

৭

সাক্ষরতা ॥ চল্লিশ বছরে অগ্রগতি মাত্র ৬ শতাংশ

॥ মাহফুজুর রহমান ॥

প্রায় চল্লিশ বছরে দেশে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে মাত্র ৬ শতাংশে অগ্রগতি হয়েছে। গত সরকারের আমলে গড়ে মাথাপিছু ১৩০ টাকা ব্যয় করে সাত লাখ লোককে অক্ষরজ্ঞান দেয়া হলেও সাক্ষরতা কর্মসূচীর সম্বুক গতি কাটেনি।

এ কর্মসূচী কার্যতঃ এখন কাগজে-কলমে বন্দী।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, ১৯৫১ সাল থেকে এ পর্যন্ত দেশে সামগ্রিক সাক্ষরতার হার ১৬.৪ শতাংশে থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ সময়কালে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত আদম শুমারির হিসেব অনুযায়ী ১৯৫১ সালে সামগ্রিক সাক্ষরতার হার ছিল ১৬.৪ শতাংশে।

৭-এর পাতায় দেখুন

বর্তমানে দেশে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সাক্ষরতা কর্মসূচী সীমিতভাবে প্রচলিত রয়েছে। ১৯৮৭ সালের শেষ দিকে সরকার সাক্ষরতা খাতে প্রায় ২৫ কোটি টাকার একটি উন্নয়ন প্রকল্পের ঘোষণাও দিয়েছেন। তবে বয়স্ক শিক্ষা কিম্বা সাক্ষরতা কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি কার্যতঃ নেই।

নিরক্ষতা দূরীকরণ ও বয়স্ক সাক্ষরতার সকল সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রমকে সমন্বিত করে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করার জন্য প্রায় দু'বছর আগে মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বয়স্ক শিক্ষা পরিদফতর স্থাপনের জন্য বলেছে। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, সমাজ সেবা, নারী শিক্ষা, কৃষি উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয় বয়স্ক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। প্রস্তাবিত পরিদফতর বেসরকারী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সমন্বয় সাধনের দায়িত্বও পালন করবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, গীর্জাসহ গ্রামের বৈঠকঘর, মিলনায়তন, অব্যবহৃত বাড়ি, সাইক্লোন, আশ্রয় কেন্দ্র ইত্যাদি স্থান এ কাজে ব্যবহৃত হবে। বিশেষতঃ ধর্মীয় অনুভূতি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (মসজিদ, মন্দির, গীর্জা)কে সাক্ষরতা কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সাক্ষরতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দশ বছর পরে ১৯৬১ সালে তা বেড়ে হয় ১৭.৬ শতাংশ। ১৯৭১ সালে কোন আদম শুমারি হয়নি এবং ১৯৭৪ সালের হিসেব মতে এ হার ছিল ২০.২ শতাংশে। ১৯৮১ সালে এ হার দাঁড়ায় ২১.২ শতাংশে। ১৯৮৫ সালের হিসেব মতে বর্তমানে সামগ্রিক সাক্ষরতা ধরা হয় প্রায় ২২ শতাংশে।

১৯১৭-১৮ সাল থেকে এদেশে স্থানীয়ভাবে নিরক্ষতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নৈশ বিদ্যালয় চালু হয়। পল্লী পুনর্গঠন দফতরের উদ্যোগে ও অর্থানুকল্যে ১৯৩৭-৩৮ সালে এ কর্মসূচী আরো ব্যাপ্তি লাভ করে। ১৯৬৩ সালে শিক্ষা পরিদফতরের অধীনে বয়স্ক শিক্ষার একটি কার্যক্রম চালু করা হয়। কিন্তু অর্থ বরাদ্দ খুবই কম থাকায় এই সাক্ষরতা কার্যক্রম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি থানার (বর্তমান উপজেলা) মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সারাদেশে এ কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য কোন প্রভাব পড়েনি। আর স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। এ সময় গণশিক্ষার জন্য কোন পৃথক উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়নি।

জানা গেছে, দেশের সাক্ষরতা কর্মসূচীর সম্বুক গতি কাটানোর লক্ষ্যে স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘদিন পরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে একটি প্রকল্প গৃহীত হয়। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতরের অধীনে একটি স্বতন্ত্র গণশিক্ষা উইং খোলা হয়। প্রকল্পটি পরিচালনার সার্বক্ষণিক দায়িত্বে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ এবং সারাদেশে গণশিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে বই, পোস্টার বিলি, গণমাধ্যমে বিশেষ প্রচার অনুষ্ঠানসহ ব্যাপক কার্যক্রম শুরু করা হয়। তবে ১৯৮২ সালের মাঝামাঝি প্রকল্পটির মূল্যায়নে বিভিন্ন কৌশলগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা চিহ্নিত হয় এবং প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। এ প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয় ছিল ৯ কোটি ৩৯ লাখ টাকা এবং মূল্যায়ন অনুযায়ী এ প্রকল্পের অধীনে গড়ে মাথাপিছু ১৩০ টাকা ব্যয়ে সাত লাখ লোককে অক্ষরজ্ঞান দেয়া হয়।